স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

কর্মযোগ-প্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. কর্ম ও তাহার রহস্য..2

২. কর্মযোগ-প্রসঙ্গে.. 12

৩. কর্মই উপাসনা.. 16

৪. স্বার্থরহিত কর্ম 18

৫. জ্ঞান ও কর্ম.. 21

৬. কর্মবিধান ও মুক্তি.. 27

১. কর্ম ও তাহার রহস্য

১৯০০ খ্রীঃ ৪ঠা জানুআরি ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলসে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আমরা জীবনে যে-সব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন্যতম এই যে, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, উপায়গুলির প্রতিও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা আমি যাঁহার নিকট লাভ করিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ, এবং তাঁহার জীবন ছিল এই মহতী নীতির বাস্তব রূপায়ন। এই একটি নীতি হইতেই আমি সর্বদা মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছি; এবং আমার মনে হয়, জীবনের সকল সাফল্যের রহস্য সেখানেই-অর্থাৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা, উপায়গুলির প্রতিও ততটা মনোযোগ দেওয়া।

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমরা আদর্শের প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়ি- লক্ষ্য আমাদের নিকট এত বেশী মনোমুগ্ধকর, এত বেশী লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানসপটে এত বড় হইয়া যায় যে, আমরা উপায়গুলি খুঁটিনাটিভাবে দেখিতে পাই না; কিন্তু যখনই বিফলতা আসে, তখন যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিব যে, উপায়গুলির প্রতি মনোযোগ দিই নাই বলিয়াই আমরা বিফল হইয়াছি। উপায়গুলিকে নিখুঁত ও দৃঢ় করার দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। উপায়গুলি যথাযথ হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবেই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কারণই কার্য উৎপাদন করে; কার্য কখনই নিজে নিজে উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণগুলি ঠিক, উপযুক্ত ও শক্তিশালী না হইলে কার্য কখনও উৎপন্ন হইবে না। একবার যখন আদর্শ নির্বাচিত ও উহার উপায়গুলি নির্ধারিত হয়, তখন আর আদর্শের কথা না ভাবিলেও পারি; কারণ উপায়গুলি নিখুঁত করিতে পারিলে আদর্শের বিষয়ে আমরা নিশ্চত হইতে পারি' যেখানে কারণ আছে, সেখানে কার্য সম্বন্ধে আর কোন বাধা নাই, কার্য অবশ্যই হইবে; আমরা যদি কারণ-বিষয়ে যত্নবান হই, তাহা হইলে কার্যও হইবে। আদর্শের উপলব্ধিই কার্য, উপায়গুলিই কারণ; সুতরাং উপায়ের প্রতি

মনোযোগ-দানই জীবন-সমস্যাসমাধানের রহস্য। এই বিষয়টি আমরা গীতাতেও পাঠ করিয়া থাকি; সেখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের কাজ করিতে হইবে, সমগ্র শক্তি দিয়া নিয়ত কাজ করিয়া যাইতে হইবে; এবং যে-কোন কাজেই আমরা নিযুক্ত হই না কেন, তাহার উপর আমাদের সমগ্র মন সমাহিত করিতে হইবে; অথচ দেখিতে হইবে, আমরা যেন কর্মে আসক্ত হইয়া না পড়ি, অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর প্রভাব যেন কর্ম হইতে সরিয়া না যাই, কিন্তু তবু সর্বাবস্থাতেই যেন ইচ্ছামাত্র আমরা কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই।

আমরা যদি নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এইঃ আমরা কোন কার্য গ্রহণ করিয়া তাহাতে

আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি; হয়তো তাহা নিষ্ফল হইল, তথাপি আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা জানি, কর্ম আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, কর্মের প্রতি আরও বেশী আসিক্ত আমাদের কেবল দুঃখই দিতেছে-তথাপি আমরা ঐ কর্ম হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মক্ষিকা মধুপান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পাগুলি মধুভান্ডে আটকাইয়া গেল! সে আর বাহির হইতে পারিল না। বার-বারই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হইতেছে। আমাদের সমগ্র জীবনই এইরূপ একটা রহস্যে আবৃত। কেন আমরা এ-জগতে আসিয়াছি? আমরা এখানে মধুপান করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি-আমাদের হাত-পা উহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে! আমরা জগৎকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই ধৃত হইয়া পড়িলাম! ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমরাই ভুক্ত হইতেছি! শাসন করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই শাসিত হইতেছি! কাজ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু অপরের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়িতেছি! এরূপ ব্যাপার আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। আমাদের জীবনে প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। অপরের মন-বুদ্ধি দ্বারা আমরা চালিত হইতেছি; আবার আমরা সর্বদাই অপরের মন-বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চাই, কিন্তু সেগুলিই আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে। আমরা চাই প্রকৃতি হইতে কিছু আহরণ করিতে, কিন্তু পরিণামে দেখিতে পাই,

প্রকৃতিই আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লয়-আমাদিগকে একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়! যদি এইরূপ না হইত, তবে জীবন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এগুলি কখনও গ্রাহ্য করিও না। আমরা যদি বিষয়ে জড়িত হইয়া না পড়ি, তাহা হইলে সর্ববিধ সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমাদের জীবন অবিরাম আনন্দোজ্জ্বল হইতে পারে।

দুঃখের ইহাই একটি কারণ যে, আমরা আসক্ত হই; আমরা নিত্য আবদ্ধ হইতেছি। এইজন্য গীতা বলিতেছেনঃ নিয়ত কর্ম কর; কর্ম কর, কিন্তু আসক্ত হইও না; কর্মে বদ্ধ হইও না। প্রত্যেক বিষয় হইতে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিবার শক্তি সঞ্চিত রাখো-কোন বস্তু যত প্রিয়ই হউক না কেন, তাহা পাইবার জন্য মন যত বেশীই ব্যাকুল হউক না কেন, তাহা ত্যাগ করিতে গেলে যত তীব্র বেদনা অনুভব কর না কেন, প্রয়োজনকালে তাহা পরিত্যাগের শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখো। এই জীবনেই হউক বা অন্য কোন জীবনেই হউক দুর্বলের স্থান নাই, দুর্বলতা দাসত্ব আনে। দুর্বলতা সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু। শতসহস্র জীবাণু আমাদের চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু যে পর্যন্ত না আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, যে পর্যন্ত না আমাদের দেহ ঐগুলি গ্রহণ করিবার জন্য পূর্বেই প্রস্তুত ও উন্মুখ হয়, সে পর্যন্ত ঐ জীবাণুগুলি আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চারিদিকে ভাসমান থাকিতে পারে; ঐগুলিকে গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। যে পর্যন্ত আমাদের মন দুর্বল না হয়, সেগুলি আমাদের

নিকট আসিতে সাহস করিবে না; আমাদিগকে আয়ত্ত করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই। জীবনের পরম সত্য এইঃ শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ; শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু।

এই জীবনে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখের উৎস আসক্তি। আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আসক্ত হই; নিজেদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আসক্ত হই; যাবতীয় বাহ্যবস্তুতে আসক্ত হই, যাহাতে ঐগুলির সাহায্যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিতে পারি। আবার এই আসক্তি ভিন্ন আর কী আছে, যাহা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আনন্দ অর্জন করিতে হইলে

আমাদিগকে আসক্তিহীন হইতে হইবে। ইচ্ছামাত্র অমাসক্ত হইবার শক্তি যদি আমাদের থাকিত, তবে কোন দুঃখই থাকিত না। কেবল সেই ব্যক্তিই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তুলাভে সমর্থ হইবেন, যিনি সমগ্র শক্তি দিয়া কোন বস্তুতে আসক্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াও প্রয়োজনকালে নিজেকে অনাসক্ত করিবারও শক্তি ধারণ করেন। কিন্তু মুশকিল এই-যতটুকু আসক্ত হইবার ক্ষমতা থাকা দরকার ততটুকু অনাসক্ত হইবার ক্ষমতাও থাকা উচিত। আবার এমন সব ব্যক্তি আছে, যাহারা কোনকিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। তাহারা ভালবাসিতে পারে না।; তাহারা কঠিনহৃদয় ও উদাসীন ; অবশ্য জীবনের অধিকাংশ দুঃখ তাহারা এড়াইয়া যায়। কিন্তু দেওয়াল কখনও দুঃখবোধ করে না, কখনও ভালবাসে না, কখনও আঘাত পায় না; তাহা হইলেও উহা দেওয়ালই থাকে। নিতান্ত অনুভূতিহীন দেওয়াল হওয়া অপেক্ষা কোন-কিছুর প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ অনুভব করা বরং ভাল। যে কখন কাহাকেও ভালবাসে না, যে কঠিনহৃদয় ও পাষাণতুল্য, সে জীবনের অধিকাংশ দুঃখ এড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হয়। এইরূপ অবস্থা আমরা কামনা করি না। ইহা দুর্বলতা, ইহা মৃত্যুতুল্য। যে-হৃদয় কখনও দুর্বলতা অনুভব করে না, দুঃখ অনুভব করে না, সে-হৃদয় কখনই জাগ্রত হয় নাই। তাহা স্পন্দনহীন জড়াবস্থা; এরূপ অবস্থা আমরা চাই না।

এইসঙ্গে কেবল প্রেমের এই মহাশক্তি, আসক্তির এই প্রবল আকর্ষণ, একটিমাত্র বস্তুর উপর সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নিজ সত্তাকে যেন অপরের জন্য নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার শক্তি-যাহা দেবতাদেরই শক্তি-আমাদের কাম্য নয়; পরন্তু আমরা দেবগণ অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর হইতে চাই। পূর্ণজ্ঞানী প্রেমের সেই একটি বিন্দুতে নিজের সমগ্র চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলেও অনাসক্তই থাকেন। এই অবস্থা কিরূপে আসে? আর এই একটি রহস্যই আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না। সে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে থাকে করুণা ও ঘৃণা; ভিক্ষুক যে নীচ ব্যক্তি, অন্ততঃ এইরূপ মনোভাব দানের পশ্চাতে থাকিয়া যায়। যাহা সে পায়, তাহা কখনও যথার্থরূপে উপভোগ করিতে পারে না।

আমরা সকলেই ভিক্ষুক। আমরা যাহাই করি, তাহারই একটা প্রতিদান চাই। আমরা সকলেই জীবন ও ধর্ম লইয়া ব্যবসা করি! হায়, আমরা প্রেম লইয়াও ব্যবসা করি!

তোমরা যদি ব্যবসা করিতে আসিয়া থাকো, আদান-প্রদান-ক্রয়-বিক্রয়ের প্রশ্নই যদি তোমাদের প্রধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি অনুসরণ কর। ব্যবসাক্ষেত্রে ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, মূল্যের উত্থান-পতনও আছে, সব সময়ে আঘাতের আশঙ্কাও আছে। ব্যাপারটি দর্পণে মুখ দেখার মতো; তোমার মুখ প্রতিবিম্বিত হইলঃ মুখভঙ্গি কর, দর্পনেও মুখভঙ্গি দেখা যাইবে; তুমি যদি হাসো, দর্পণও হাসিবে-তাহাতে হাসি প্রতিবিম্বিত হইবে। ইহাই ক্রয়-বিক্রয়, ইহাই আদান-প্রদান।

আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়ি। কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি? যাহা দিই তাহার জন্য নয়, পরন্তু যাহা আশা করি তাহার জন্যই। প্রেমের প্রতিদানে পাই আমরা দুঃখ-ভালবাসি বলিয়া নয়, পরন্তু প্রতিদানে ভালবাসা চাই বলিয়া। আকাঙ্ক্ষা যেখানে নাই, দুঃখ সেখানে থকে না। বাসনা-অভাববোধই সকল দুঃখের মূল। সফলতা ও বিফলতার নিয়মে বাসনাসমূহ আবদ্ধ। বাসনা অবশ্যই দুঃখ আনিবে।

সুতরাং প্রকৃত সফলতা, প্রকৃত সুখের শ্রষ্ঠ রহস্য এইঃ যিনি প্রতিদান চান না-যিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য। কথাটি হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। আমরা কি জানি না-প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি জীবনে প্রতারিত হন, আঘাতপ্রপ্ত হন? আপাততঃ তাহাই বটে। ‘যীশুখ্রীষ্ট নিঃস্বার্থ ছিলেন, তথাপি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন’-সত্য বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, এক মহান্ বিজয়ের-কোটি কোটি মানুষের জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের কল্যাণে মন্ডিত করিবার জন্যই তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতা।

কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিও না; প্রতিদানে কিছুই চাহিও না। যাহা তোমার দিবার আছে দাও; ইহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না। সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া ইহা ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না। দানের শক্তি লাভ কর; দাও-ব্যস, সেখনেই শেষ। শিক্ষা কর-দান করিবার জন্যই এ-

জীবন, প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে; সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে-যাহা দেয়, তাহা দিতেই হইবে। তুমি এই সংসারে আসো সঞ্চয় করিবার জন্য। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তুমি গ্রহণ করিতে চাও; কিন্তু প্রকৃতি তোমার গলা টিপিয়া তোমাকে দান করিতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে দিতেই হইবে। যে মুহূর্তে তুমি বলিবে, 'আমি দিব না', সেই মুহূর্তেই আঘাত আসিয়া তোমাকে দুঃখ দিবে। এমন কেহই নাই, যে পরিণামে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য না হইবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে যত বেশী সংগ্রাম করিবে, সে তত বেশী দুঃখ

অনুভব করিবে। আমরা ত্যাগ করিতে সাহস করি না বলিয়াই, প্রকৃতির এই বিরাট দাবি বিনীতভাবে মানিয়া লইতে স্বীকার করি না বলিয়াই দুঃখ পাই। ধর, অরণ্য লোপ পাইল, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ আমরা সূর্যের উত্তাপ পাই। সূর্য সাগর হইতে জল আহরণ করিয়া বৃষ্টিধারারূপে উহা প্রত্যর্পণ করে। তুমি আদান-প্রদানের যন্ত্রস্বরূপ; তুমিও দান করিবার জন্যই গ্রহন কর। সুতরাং প্রতিদানে কিছুই চাহিও না; যতই দান করিবে, ততই সব-কিছু তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যত শীঘ্র এই কক্ষটি বায়ুশূন্য করিবে, তত শীঘ্র ইহা বাহিরের বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইবে; কিন্তু সমস্ত দরজা, সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকিবে, বাহিরের বায়ু কখনও ভিতরে আসিবে না; ফলে ভিতরের বায়ু গতিহীন হইয়া দূষিত ও বিষাক্ত হইবে। নদী অবিরত সাগরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষিত করিতেছে এবং পূর্ণ হইতেছে। সাগরের মধ্যে নদীর নির্গমন রুদ্ধ করিও না; যে মুহূর্তে ইহা করিবে, সেই মুহূর্তে তুমি মৃত্যুর কবলে পড়িবে।

সুতরাং ভিক্ষুক হইও না; অনাসক্ত হও। ইহাই জীবনের সর্বাধিক দুষ্কর কার্য। এই পথের যে কি বিপদ, তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না। এমন কি, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই পথের বাধাবিঘ্নগুলি অবগত হইয়াও যতক্ষণ না মনেপ্রাণে অনুভব করি, ততক্ষণ ঐগুলিকে ঠিক ঠিক আমরা জানিতে পারি না। দূর হইতে একটি প্রমোদউদ্যানের সাধারণ দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? যখন আমরা উদ্যানের মধ্যে

থাকি, তখনই উহা কিরূপ অনুভব করি, এবং যথার্থরূপে জানিতে পারি। যদিও আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং আমরা মর্মাহত ও বিপর্যস্ত হই, তথাপি সকল বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে সতেজ রাখিতে হইবে-এই সমস্ত বিঘ্ন-বিপর্যয়ের মধ্যেও আমাদের অভ্যন্তরীণ দেবত্বকে দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রকৃতি চায়-আমরা প্রতিক্রিয়াশীল হই, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করি, প্রতারণার বিনিময়ে প্রতারণা করি, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যার আশ্রয় লই, আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা আঘাতের সমুচিত উত্তর দিই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত না করিতে হইলে নিজেকে সংযত করিতে-সর্বোপরি অনাসক্ত হইতে এক বিরাট দিব্য শক্তির প্রয়োজন।

প্রতিদিন আমরা নিত্য নূতনভাবে অনাসক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হই। আমরা আমাদের অতীত ভালবাসা ও আসক্তির বিষয়গুলির দিকে তাকাই এবং অনুভব করি, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের জীবন কিরূপ দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের 'ভালবাসা'র জন্যই আমরা নৈরাশ্যের অতলগর্ভে চলিয়া গিয়াছি! বুঝিতে পারিলাম, আমরা অপরের হস্তে নিতান্ত ক্রীতদাস; আমাদের টানিয়া নিম্ন হইতে নম্নতর অবস্থায় নামানো হইয়াছে! আবার আমরা নূতনভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হইঃ এখন হইতে আমি নিজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিব, এখন হইতে নিজেকে সংযত করিব। কিন্তু কার্যকালে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়! আবার জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে, আর বাহির

হইতে পারে না। জীব পক্ষী জালে আবদ্ধ-পক্ষসঞ্চালন করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ইহাই আমাদের জীবন!

আমি জানি নিজেকে সংযত করা কত কষ্টকর! বাধাবিপত্তিগুলি প্রচন্ড; এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি; কালক্রমে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখবাদী হইয়া সাধুতা, প্রেম এবং জীবনে যাহা কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হরাই। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল, দয়ালু, অকপট ও ক্ষমাশীল থাকেন, তাঁহারাই বার্ধক্যে সত্যের মুখোশ-পরা মিথ্যাচারীতে

পরিণত হন। তাঁহাদের মন যেন স্তূপীকৃত জটিলতা! হয়তো বা তাঁহাদের মধ্যে অনেকটা বাহ্য বিচক্ষণতা থাকিতে পারে, তাঁহারা উগ্র-মস্তিষ্ক নন; তাঁহারা বিশেষ কথা বলেন না, কাহাকেও অভিশাপ দেন না, ক্রুদ্ধও হন না; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতে পারাও তাঁহাদের পক্ষে ভাল ছিল, অভিশাপ দিতে পারাও সহস্রগুণ ভাল ছিল। তাঁহারা তাহা পারেন না; তাঁহাদের হৃদরবৃত্তি স্তব্ধ, কারণ তাঁহাদের দেহে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাগিয়াছে, তাঁহারা নিষ্ক্রিয়, এমন কি অভিসম্পাত করিতেও পারেন না, একটি কর্কশ কথাও বলিতে পারেন না।

এ-সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। তাই বলি-আমাদের অসাধারণ ঐশী শক্তির প্রয়োজন। সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, অসাধারণ ঐশী শক্তিই একমাত্র উপায়-মুক্তির একমাত্র পথ। একমাত্র ইহারই সাহায্যে আমরা সব জটিলতা অতিক্রম করিতে পারি-অক্ষতদেহে অজস্র দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আমরা খন্ডবিখন্ড হইতে পারি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া উঠিবে।

ইহা খুবই কঠিন, কিন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা আমরা ইহা অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের বুঝিতে হইবে-আমাদের কোন বিপদই ঘটিতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমরা নিজদিগকে উহার অনুকুল ক্ষেত্রে পরিণত করি। এইমাত্র বলিয়াছি, যতক্ষণ দেহে রোগের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ কোন রোগ কাছে আসিতে পারে না; রোগ কেবল জীবাণুর উপর নির্ভর করে না, পরন্তু দেহস্থ রোগপ্রবণতার উপরও নির্ভর করে। আমরা যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পাইয়া থাকি। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ইহাই যেন আমরা উপলব্ধি করি-সঙ্গত কারণ ছাড়া কেহ কখনও দুঃখগ্রস্ত হয় না। কখনও কোন আঘাত অকারণে আসে নাই; কখনও এমন কোন অকল্যাণ সংঘটিত হয় নাই, যাহার জন্য আমি নিজহস্তে পথ প্রস্তুত করি নাই। ইহাই আমাদের জানিতে হইবে। নিজেদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, যে-কোন আঘাত পাইয়াছ, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলে বলিয়াই তাহা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তোমরা করিয়াছ অর্ধেক প্রস্তুতি, বাকী অর্ধ করিয়াছে বহির্জগৎ। এইপ্রকারেই আঘাত আসিয়াছিল। এই উপলব্ধিই

আমাদিগকে শান্ত করিবে। একই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ হইতেই একটি আশার বাণী আসিবে এবং সেই

আশার বাণী এইরুপঃ বাহ্য প্রকৃতির উপর আমার কোন প্রভাব নাই। কিন্তু যাহা আমার ভিতরে, যাহা আমর নিকটতর, অর্থাৎ আমার নিজস্ব জগৎ, তাহা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনে ব্যর্থতা ঘটাইতে যদি উভয়েরই প্রয়োজন হয়, আমাকে আঘাত দিতে যদি উভয়েরই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই দুইটির মধ্যে যাহা আমার হাতে, তাহা আমি ছাড়িয়া দিব না; এক্ষেত্রে কেমন করিয়া আঘাত আসিতে পারে? আমি যদি নিজের উপর যথার্থ প্রভাব বিস্তার করিতে পারি, তাহা হইলে আঘাত কখনই আসিবে না।

শৈশব হইতে সর্বদাই আমরা বাহিরের কোন বস্তুর উপর দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা সর্বদাই পরকে সংশোধন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সংশোধন করিতে প্রস্তুত নই, দুর্দশায় পড়িলে আমরা বলি, 'হায়! এ জগৎ দানবের রাজ্য।' আমরা অন্য লোককে অভিশাপ দিয়া বলি, 'কি অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন মূর্খের দল!' কিন্তু আমরা নিজেরা যদি প্রকৃতই এত সৎ হই, তবে কেন এরূপ জগতে আছি? এ জগৎ যদি শয়তানের-রাজ্য হয়, তবে আমরাও দানব; নতুবা কেন আমরা এ জগতে থাকিব? 'হায়! এ জগতের লোকগুলি এত স্বার্থপর!'-এ-কথা সত্য, কিন্তু আমরা যদি তাহাদের চেয়ে ভাল হই, তবে তাহাদের সঙ্গে কেন আমরা বাস করিব? এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ।

যেটুকুর যোগ্যতা আমাদের আছে, সেটুকুই আমরা পাইয়া থাকি। এ-কথা বলা মিথ্যা যে, জগৎ অসৎ আর আমরা কেবল সৎ। ইহা কখনই হইতে পারে না; এইরূপ আমরা বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহা সত্যের প্রচন্ড অপলাপ।

সর্বাগ্রে ইহাই শিক্ষণীয়ঃ বাহিরের কোনকিছুকে অভিসম্পাত না দিতে অথবা কাহারও উপর দোষারোপ না করিতে বদ্ধপরিকর হও। মানুষ হও, উঠিয়া দাঁড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখিবে ইহাই সর্বদা সত্য পথ। নিজেকে বশে আনো।

ইহা কি লজ্জার বিষয় নয় যে, কখন কখন নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কত বড় বড় কথা বলি, বলিয়া থাকি আমরা দেবস্বরূপ, ঘোষণা করি আমরা সব-কিছুই জানি, আমরা সব-কিছুই করিতে পারি, আমরা নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ; আবার পরমুহূর্তে একটি ক্ষুদ্র-প্রস্তরখন্ড আমাদিগকে কষ্ট দেয়; কোন সাধারণ ব্যক্তির অল্প ক্রোধও আমাদিগকে পীড়া দেয়-পথের যে-কোন নির্বোধ ব্যক্তিও 'এই-সব দেবতাদের' জীবন দুঃখময় করিয়া তোলে! আমরা যদি সত্যই দেবস্বরূপ হই, তাহা হইলে কি আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হওয়া উচিত? বাহ্য জগৎই আমাদের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী-এইরূপ অভিযোগ কি সত্য? যে-ঈশ্বর শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, তিনি কি আমাদের কোন ছল-চাতুরী দ্বারা দুঃখগ্রস্ত হইতে পারেন? তোমরা যদি যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহা হইলে বলিতে হইবে-তোমরা ঈশ্বরতুল্য। কোন্ বহির্জগৎ তোমাদিগের উপর আঘাত হানিতে পারে? তোমরা অক্ষতদেহে সপ্তম নরকও অতিক্রম করিতে পারো, কিছুই তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমরা যে অভিযোগ কর, বহিঃপ্রকৃতির উপর দোষারোপ কর-তাহাই প্রমাণ করে যে, তোমরা বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন এবং তোমাদের এইরূপ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের স্বরূপ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তোমরা যে দাবি কর, বস্তুতঃ তোমরা তাহা নও। দুঃখের উপর দুঃখ স্তূপীকৃত করিয়া, কেবল বহিঃপ্রকৃতি তোমাদিগকে আঘাত হানিতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়া এবং 'হায়'! কি ভীষণ শয়তানের জগৎ! 'লোকটি আমাকে আঘাত করিতেছে, ঐ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিতেছে' ইত্যাদি চীৎকার করিয়া তোমরা নিজেদের অপরাধ, দুঃখ দুর্দশা বাড়াইয়া তুলিতেছ। একে তো দুঃখ পাইতেছ, তদুপরি মিথ্যা আরোপ করিতেছ। কিছুকালের জন্য অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে; এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি। এস, আমরা কর্মের উপায়গুলি নিখুঁত করিয়া তুলি; তাহা হইলে উদ্দেশ্যও স্বতই ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদের জীবন যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হইতে পারে। জগৎ কার্য-স্বরূপ, আমরা কারণ-স্বরূপ। সুতরাং এস, আমরা নিজেদের নিষ্কলুষ ও পূর্ণ করিয়া তুলি।

২. কর্মযোগ-প্রসঙ্গে

যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্ করাই আমাদের লক্ষ্য। এই অবস্থা লাভ হইলে বোধ হইবে, আত্মা সর্বকালে একাই বিদ্যমান ছিলেন-তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। সুখী হইবার জন্য আমরা যতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকিবে, ততদিন আমরা ক্রীতদাস। 'পুরুষ' যখন দেখেন তিনি মুক্ত, তাঁহার পূর্ণতার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই এবং এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তখন মুক্তি বা 'কৈবল্য' লাভ হয়।

কয়েকটা ডলারের প্রত্যাশায় মানুষ ছুটাছুটি করে এবং ইহার জন্য সে তাহার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাহারা যদি নিজেদের সংযত করিতে পারে, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের চরিত্র এরূপ উন্নত হইবে যে, তখন তাহারা ইচ্ছা করিলেই লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করিতে পারিবে। তখন তাহাদের ইচ্ছাশক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। কিন্তু আমরা সব বড়ই নির্বোধ!

একজনের ভুলত্রুটির কথা সর্বসমক্ষে বলিয়া লাভ কি? এভাবে ত্রুটি সংশোধিত হয় না। কারণ কৃতকর্মের জন্য মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবেই। অবশ্যই চেষ্টা করিয়া উন্নতিলাভ করিতে হইবে। যাহারা দৃঢ় এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাদেরই প্রতি সহানুভূতিশীল। যে-কাজ মানবজাতি ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে করিয়া দেওয়া হয়, তাহাই আসক্তি বা বন্ধনের কারণ হয় না।

কোন প্রকার কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। নিম্নতর কার্য করে বলিয়াই একজন-যে উচ্চতর কার্য করে তাহার তুলনায় নিম্নস্তরের হয় না। কে কিরূপ কর্তব্য করিতেছে দেখিয়া মানুষকে বিচার করা উচিত নয়; সেই কর্তব্য সে কিভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বিচার করা উচিত। ঐ কার্য করিবার ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষা। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ ব্যবসায় ও কর্ম

অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত জুতা প্রস্তুত করিতে পারে, সে বড়।

প্রত্যেক কর্মই পবিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। বদ্ধ ব্যক্তিদের মোহগ্রস্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানালোক দিতে কর্তব্য প্রভূত সহায়তা করে, সন্দেহ নাই।

আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে-যাহা এখন আমাদের হাতে আছে, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় ও সন্মানজনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমরা লাভ করিব।

প্রকৃতির বিচার সর্বত্রই সমানভাবে কঠোর এবং নির্দয় হইয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাবহারিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট জীবন ভাল বা মন্দ কোনটিই নয়।

প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকার্যতার পশ্চাতে কোথাও অসাধারণ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা বর্তমান। ইহাই তাহার জীবনে বিরাট সফলতার হেতু। সে হয়তো সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইতে পারে নাই, কিন্তু সে ক্রমশঃ এই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সে যদি সম্পর্ণরূপে স্বর্থশূন্য হইতে পারিত, তবে তাহার জীবন বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবনের মতো মহান্ ও সার্থক হইতে পারিত। স্বর্থশূন্যতার তারতম্যের উপরই সর্বক্ষেত্রে সফলতার তারতম্য নির্ভর করে।

মানবজাতির মহান্ নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চতর কর্মক্ষেত্রের জন্যই আসেন। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ পবিত্র বা একেবারে অপবিত্র-এখানে ‘পবিত্রতা’ অথবা ‘অপবিত্রতা’ হিংসা বা অহিংসা অর্থে গ্রহন করিতে হইবে। আমরা অপরের অনিষ্ট না করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ বা জীবন ধারন করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া।

আমাদের বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুন অপর কতকগুলি প্রাণীর স্থানাভাব হইতেছে- হয়তো কোন মানুষের বা অপর প্রাণীর বা কোন ছোট উদ্ভিদের-কিন্তু যাহারই হউক না কেন, আমরা কোন না কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাই যদি হইল, তবে স্বভাবতই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কর্মের

দ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ হয় না। আমরা অনন্তকাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার- যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পথ পাইব না; আমরা ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু কাজ কখনও শেষ হইবে না।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসার সহিত কাজ করে, ফলাফলের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ক্রীতদাসকে চাবুক মারার প্রয়োজন হয়; ভৃত্য পারিশ্রমিক চায়। জীবনের সর্বত্র এইরূপ। জনসভার কোন বক্তা একটু বাহবা চায়। এইগুলি না দিয়া যদি তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে, কেন-না এইগুলি তাহার প্রয়োজন। ইহাই ক্রীতদাসের ভাবে কাজ করা। এরূপ অবস্থায় প্রতিদানে কিছু আশা করা অভ্যাস হইয়া পড়ে। ইহার পর ভৃত্যের মতো কর্ম করা। ভৃত্যের প্রয়োজন পারিশ্রমিকের- 'আমি ইহা দিতেছি, তুমি উহা দাও।' 'কর্মের জন্য কর্ম করি'-এ-কথা বলার মতো সহজ আর কিছুই নাই। কিন্তু এইভাবে কর্ম করার মতো কঠিন আর কিছুই নাই। কর্মের জন্য কর্ম করে-এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও বহুদূর যাইতে রাজী আছি। কোথাও হয়তো একটি অভিসন্ধি থাকে। যদি অর্থের অভিসন্ধি না হয়, তবে প্রভুত্বের মতলব। যদি প্রভুত্ব না হয়, তবে লাভের উদ্দেশ্য। কোনরূপে কোথাও একটি প্রেরণা থাকিবেই। তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমার জন্য তোমার সহিত কাজ করিতে চাই। এ পর্যন্ত বেশ চমৎকার এবং প্রতিমুহূর্তে আমি আমার আন্তরিকতা ঘোষণা করিতে পারি। কিন্তু সাবধান, তোমাকে আমার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইতে হইবে। যদি তুমি একমত হইতে না পারো, তবে আমি আর তোমায় দেখিব না বা তোমায় সাহায্য করিব না! এরূপ অভিসন্ধিমূলক কর্ম দ্বারা দুঃখ হয়। মনকে বশে রাখিয়া আমরা যে কাজ করি, সে কাজই অনাসক্তি ও আনন্দের কারণ হয়।

একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমার মাপকাঠিতে সমগ্র জগৎকে বিচার করিলে চলিবে না। প্রত্যেক লোককে তাহার ভাব অনুযায়ী বিচার করিতে হইবে, প্রত্যেক জাতিকে উহার আদর্শ অনুযায়ী এবং প্রতিটি প্রদেশের প্রতিটি রীতি-নীতি নিজস্ব যুক্তি ও অবস্থা অনুসারে বিচার করিতে হইবে। আমেরিকানরা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করে, তাহার প্রভাবেই আমেরিকাবাসীদের রীতি-নীতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং ভারতবাসীদের পরিবেশের ফলেই ভারতীয় রীতি-নীতির উদ্ভব। এইভাবে চীন জাপান প্রভৃতি দেশের পক্ষেও এ-কথা প্রযোজ্য।

আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের পরিবেশ গড়িয়া উঠে। খেলার সময় প্রতিটি গোলক উহার যথানির্দিষ্ট গর্তে গিয়া পতিত হয়। যদি একজনের কর্মক্ষমতা অপরের চেয়ে বেশী হয়, তবে সাংসারিক বিন্যাসে তাহা ধরা পড়িবেই। সুতরাং অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই। কোন একজন ধনী হয়তো দুষ্ট, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছে, যাহার ফলে সে ধনী হইয়াছে। অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাকিলে সেও ধনশালী হইতে পারিবে। পরস্পর বিবাদ এবং অভিযোগ করিয়া কি ফল? ইহা দ্বারা আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিব না। কাহাকেও ছোট কিছু করিতে হইতেছে বলিয়া যদি সে অভিযোগ করে, তবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে অভিযোগ করিবে। সর্বক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিবে এবং সমস্ত কিছুই পন্ড হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য কর্মে নিয়ত অবিচল থাকিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, সে-ই আলোকের সন্ধান পায় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্তব্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

৩. কর্মই উপাসনা

শ্রেষ্ঠ মানব কর্ম করিতে পারেন না-কারণ তাঁহার মধ্যে কোন বন্ধনের ভাব, আসক্তি বা অজ্ঞান নাই। একবার নাকি একটি জাহাজ এক চুম্বকের পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতেছিল। জাহাজের লোহার স্ক্রু পেরেক নাট বোল্টুগুলি আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিল এবং জাহাজটি খন্ডবিখন্ড হইয়া গেল। অজ্ঞানের অবস্থাতেই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা থাকে, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই নাস্তিক। যথার্থ আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ম করিতে পারেন না। আমরা অল্পবিস্তর নাস্তিক। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসও নাই। তিনি আমাদের নিকট কথার কথা মাত্র, অর্থাৎ 'ঈশ্বর' এই শব্দমাত্র, ইহার বেশী কিছু নন। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, তিনি আমাদের অতি নিকট, কিন্তু তারপর আবার পূর্বাবস্থায় পতিত হই। তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে কে কাহার জন্য কর্ম করিবে? ঈশ্বরকে সাহায্য করা! আমাদের ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, যাহার অর্থঃ বিশ্বকর্মাকে কি শিখাইতে হইবে, কি করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়? সুতরাং মানবজাতির মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা কোন কর্ম করেন না। অতঃপর যখন তোমরা জগৎ সম্বন্ধে এবং ভগবানকে আমরা কিরূপে সাহায্য করিতে পারি, তাঁহার জন্য ইহা করিতে পারি, উহা করিতে পা ইত্যাদি মূর্খের মতো কথাগুলি শুনিবে, তখন ঐ উক্তি মনে বাখিও। এইরূপ কোন চিন্তাই যেন তোমাদের ভিতর স্থান না পায়। এগুলি অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত। তুমি যে-সকল কর্ম কর, সবই তোমার নিজের জন্য, এগুলি তোমার নিজের উপকার হইবে বলিয়াই করিয়া থাকো। ঈশ্বর এমন কিছু খানায় পড়িয়া যান নাই যে, তুমি বা আমি একটি হাসপাতাল বা অনুরূপ কিছু নির্মাণ করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইব। তিনি তোমাকে কর্মের সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার এই বিরাট ব্যায়মশালায় তোমার পেশীসমূহ চালনা করিবার জন্যই তিনি তোমাকে সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়; তুমি যাহাতে নিজেকে সাহায্য করিতে পারো, এইজন্য। তুমি কি মনে কর যে, একটি পিপীলিকাও তোমার সাহায্য ব্যতীত মরিয়া যাইবে? ইহা পুরাদস্তুর ঈশ্বরনিন্দা! জগৎ তোমার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। জগৎ

চলিতে থাকিবে-তুমি এই মহাসমুদ্রে একটি বারিবিন্দু মাত্র। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না-বাতাস বহিতে পারে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম করিবার সুযেগ লাভ করিয়াছি-তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়। 'সাহায্য' এই শব্দটি তোমরা মন হইতে মুছিয়া ফেলো। সাহায্য তুমি করিতে পার না। এরূপ বলা ঈশ্বরের নিন্দা করা। তাঁহার কৃপাতেই তোমার অস্তিত্ব-তুমি কি মনে কর, তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছ? তুমি তাঁহার উপাসনা করিতেছ। যখন কুকুরকে একটুকরা খাবার দাও, তখন ঐ কুকুরকে ঈশ্বররূপেই পূজা করিতেছ। ঐ কুকুরের ঈশ্বর রহিয়াছেন। তিনি কুকুররূপে প্রকাশিত। তিনিই সব এবং সকলের মধ্যে তিনি। আমরা তাঁহাকে পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মাত্র। সমগ্র বিশ্বকে এই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ, তবেই পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। ইহাই তোমার কর্তব্য হউক। ইহাই কর্মের যথার্থ মনোভাব। কর্মযোগ এই রহস্যই আমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

৪. স্বার্থরহিত কর্ম

১৮৯৮ খ্রীঃ ২০শে মার্চ কলিকাতা বাগবাজার ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে রামকৃষ্ণ বসু স্টীটে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২ তম অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় এইভাবে বলিয়াছিলেনঃ

গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ চলিতেছিল। একদল বৈদিক যাগযজ্ঞ, পশুবলি এবং ঐ প্রকার কর্মসমূহকেই ধর্মের সমগ্র রূপ বলিয়া মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে, অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করা ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্ন্যসী এবং জ্ঞানমার্গী। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানলাভই মোক্ষের একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁহার নিষ্কাম কর্মের মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর-বিরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করিলেন। অনেকের ধারণা যে, গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই-পরবর্তী কালে মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা ঠিক নয়। মহাভারতের প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণীগুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীতা যদি মহাভারতের অংশ হিসাবে বিবেচিত না হয় এবং বাদ দেওয়া হয়, তবে মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেইগুলিও সমভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এখন নিষ্কাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহা এই অর্থে বুঝেন যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সুখ বা দুঃখ কোনটিই কর্মীর মন স্পর্শ না করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যহি ইহাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে, বলিতে হইবে। কোন কোন প্রাণী তাহাদের শাবকগুলি খাইয়া ফেলে এবং ইহার জন্য তাহাদের কোন দুঃখই হয় না।

দস্যুরা অন্যের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ করে। এই কাজ করিবার সময়ে যদি সুখ বা দুঃখের কোন প্রকার অনুভূতি তাহাদের না থাকে, তবে তাহারাও তো

নিষ্কাম হইয়া কাজ করে বলিতে হইবে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিনহৃদয় দুরাচারও নিষ্কাম কর্মী বলিয় বিবেচিত হইতে পারে। দেওয়ালের সুখদুঃখের কোন অনুভূতি নাই, একটি প্রস্তরখন্ডেরও ঠিক তাই-এই কারণে এ-কথা বলা যায় না যে, উহারাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে। ঐভাবে উহার অর্থ করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম দুষ্ট লোকদের হাতে একটি শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহারা দুষ্কর্ম করিতে থাকিবে এবং মুখে বলিবে, তাহারা নিষ্কাম কর্ম করিতেছে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে গীতা একটি ভয়াবহ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এরূপ নয়। অধিকন্তু গীতাপ্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অর্জুন যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্রোণকে বধ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি, বাসনা এবং ক্ষুদ্র আমিত্বকে লক্ষবার বিসর্জন দিয়াছিলেন।

গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেন। যোগারূঢ় হইয়া আমাদের কর্ম করিতে হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র 'অহং'-বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করিলে 'আমি ইহা করিতেছি, উহা করিতেছি'-এই বোধ কখনও থাকে না। পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহা হৃদয়ংগম করিতে পারে না. তাহারা বলে যে, যদি 'অহং'-বোধ না থাকে, যদি ইহা বিলুপ্ত হয়, তবে মানুষ কিরূপে কর্ম করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব-বোধ ত্যাগ করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহা অনন্তগুণ উৎকৃষ্ঠতর হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে। আমরা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি; অন্যান্য অনেক কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপে যেন সমাধিমগ্ন হইয়া করি। চিত্রকর যদি অহংবোধ ভুলিয়া চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্রসমূহ আঁকিতে পারিবে। উত্তম পাচক যে-সকল খাদ্যবস্তু লইয়া কাজ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্য বোধসকল তিরোহিত হয়। এইরূপেই তাহারা তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এইরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত

কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ করেন না; এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহারা এইভাবে কর্ম করেন, তাঁহারা নিজের জন্য কখনও কিছু করেন না।

প্রত্যেক কর্মের ফলই শুভাশুভ-মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নাই, যাহাতে অশুভের কোন স্পর্শ নাই। অগ্নির চতুর্দিকে যেমন ধূম থাকে, তেমনি কর্মের সহিত কিছু অশুভ সর্বদাই থাকে।

আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যাহা দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়। অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না, অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আসিত। একদল গর্বিত অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত এবং প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন, কিন্তু একটি কাজও তিনি নিজের জন্য করেন নাই। প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দীপালোকে আমরা গীতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু কিছুসংখ্যক পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কর্মের মধ্যে কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই। যাঁহারা কাঁচা অহং-বোধ বিসর্জন দিয়া কর্ম করেন দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাঁহারা কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও মুক্তিলাভ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের এই রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন।

৫. জ্ঞান ও কর্ম

১৮৯৫ খ্রীঃ ২৩শে নভেম্বর লন্ডনে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

চিন্তার শক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি পাওয়া যায়। বস্তু যত সূক্ষ্ম, ইহার শক্তিও ততই বেশী। চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মানুষকেও প্রভাবিত করে, কারণ মন এক, আবার বহু। জগৎ যেন একটি মাকড়সার জাল, মনগুলি যেন মাকড়সা।

এই জগৎ সর্বব্যাপী এক অখন্ড সত্তারই প্রকাশ। ইন্দ্রয়গুলির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই সত্তা এই জগৎ। ইহাই মায়া। অতএব জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সত্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দর্শন, আংশিক প্রকাশ-প্রভাতে যেমন সূর্যকে একটা লাল বলের মতো দেখায়। এইভাবে যা কিছু অশুভ ও মন্দ, তা প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা মাত্র, ভালোরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ।

সরলরেখাকে অনন্ত পর্যন্ত বর্ধিত করিলে একটি বৃত্তেই পরিণত হয়। ভালোর সন্ধান আত্মানুসন্ধানেই ফিরিয়া আসে। 'আমি'ই রহস্যের সমগ্র রূপ-ঈশ্বর। কাঁচা আমিই দেহ; আবার আমিই বিশ্বের পরমেশ্বর।

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ হইবে কেন?-কারণ ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হইবে। যাহা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনন ও ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে, তাহাই নৈতিক। যাহা কিছু ইহার বিপরীত, তাহাই দুর্নীতি। দেশভেদে ব্যক্তিভেদে ইহার মানও পৃথক্। মানুষকে বিধিনিষেধ শাস্ত্রবচন প্রভৃতির দাসত্ব হইতে মক্তিলাভ করিতে হইবে। এখন আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু যখন মুক্ত হইব, তখন ইচ্ছা স্বাধীন।

সংসারকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার নামই ত্যাগ। ইন্দ্রিয়-দ্বারেই ক্রোধ আসে, দুঃখ অনুভূত হয়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হইয়া যাও।

একদা আমার দেহ ছিল, জন্ম হইয়াছিল, আমি জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম এবং মরিয়া গেলাম: কি ভয়াবহ প্রহেলিকা! দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তির জন্য কাতর ক্রন্দন!

কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি এই যে, আমাদের সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে? তাহা হইলে কে অপরকে সাহায্য করিবে? ত্যাগের অর্থ তপস্বী হওয়া নয়। সকল ভিক্ষুকই কি খ্রীষ্ট? দারিদ্র্য ও সধুতা সমার্থক নয়; অনেক সময় ঠিক বিপরীত। প্রকৃত ত্যাগ মনের ব্যাপার। কিভাবে এই ত্যাগ আসে? মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি একটি হ্রদ দেখিলাম-চারিদিকে মনোরম দৃশ্যাবলীতে বৃক্ষরাজীর বিপরীত প্রতিচ্ছবি জলের মধ্যে দেখা যাইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই মরীচিকা বলিয়া প্রমাণিত হইল। তখন বুঝিলাম, মাসাবধি প্রতিদিনই আমি এই দৃশ্য দেখিয়াছি; শুধু সেদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি ঠেকিয়া শিখিলাম যে, উহা মিথ্যা। পরেও-প্রতিদিনই আমি ইহা আবার দেখিব, কিন্তু সত্য বলিয়া আর কখনও স্বীকার করিব না। সুতরাং আমরা যখন ঈশ্বরলাভ করি, তখন জগৎ দেহ প্রভৃতির ভাব চলিয়া যাইবে। এগুলি পরে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তখন আমরা এগুলি মিথ্যা বলিয়াই জানিব।

পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মতো মহাপুরুষদের জীবনেতিহাস। নিষ্কাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ করেন। দীনদরিদ্রের বস্তিতে যীশুর কথা ভাবো। দুঃখের পারে স্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভাই সব, তোমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান।' তাঁহার কর্ম শান্ত, নীরব। দুঃখের কারণগুলিই তিনি দূর করেন। যখন তুমি সত্যসত্যই জানিবে যে, এই কর্ম নিতান্তই মায়া, তখনই জগতের হিতের জন্য কিছু করিতে পারিবে। এই কর্ম যতই অজ্ঞাতসারে কৃত হয়, ততই ভাল হয়, কারণ তাহা হইলেই কর্ম চেতনভাবের আরও উর্ধ্বে উপনীত হয়, অতিচেতন হয়। ভাল বা মন্দ কোনটাই আমাদের সন্ধানের বিষয় নয়, তবে সুখ ও মঙ্গল দুঃখ ও অমঙ্গল অপেক্ষা সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা কাঁটা বিঁধিয়াছিল, আর একটি কাঁটা সে ইহা তুলিয়া ফেলিল। এই প্রথম কাঁটাটি মন্দ, আর দ্বিতীয়টি ভাল। আত্মা সেই শান্তি, যাহা ভাল ও মন্দ উভয়কেই অতিক্রম করে। বিশ্বসংসার বিলীন হইয়া যায়, তখনই মানুষ ভগবানের নিকটবর্তী হইতে থাকে। ক্ষণেকের জন্য সে স্বরূপ ফিরিয়া পায়, ঈশ্বরই হইয়া যায়। আবার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরূপে তিনি আবির্ভূত হন; তখন জগৎ-সংসার তাঁহার সম্মুখে কাঁপিতে থাকে। মূর্খ নিদ্রিত হয়, মূর্খরূপেই জাগরিত হয়। অজ্ঞান মানুষ-অতীন্দ্রিয়

জ্ঞান লাভ করিয়া, অনন্ত শক্তি পবিত্রতা ও প্রেমের অধিকারী হইয়া দেব-মানবরূপে ফিরিয়া আসে। অতীন্দ্রিয় অবস্থার ইহাই কর্যকারিতা।

যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধনা করা চলে। গীতা তো এইভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল।

মনের তিনটি অবস্থা আছেঃ সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এবং শান্ত। নিষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন, সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং শান্তভাবের বৈশিষ্ট্য তীব্রতম স্পন্দন। আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে। দেহ রথ, ইন্দ্রিয়নিচয় অশ্ব, মন লাগাম, এবং বুদ্ধি সারথি। এইভাবেই মানুষ মায়া অতিক্রম করে; সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাভ করে। মানুষ যতক্ষণ ইন্দিয়গুলির অধীন, ততক্ষণ সে এই সংসারের। যখন ইন্দ্রিয়গুলি জয় করে, তখন সে যথার্থ ত্যাগী।

দুর্বল ও নিষ্কিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না; সেক্ষত্রে সংগ্রামই ভাল। পার্থসারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, 'আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত' এবং বলিয়াছিলেন, 'অর্জুন, তুমি মহাজ্ঞানীর মতো কথা বলিতেছ, কিন্তু তুমি নিজে তো জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ।' জলে থাকিয়াও যেমন পদ্মপত্র জলদ্বারা সিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাকিবে। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র-এখান হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতে থাকো। সংসারের এই জীবন ঈশ্বরলাভের একটি প্রয়াস। ত্যাগের বলে বলীয়ান্ ইচ্ছাশক্তির বিকাশরূপে তোমার জীবন গড়িয়া তোল। জ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিতে হইবে।

প্রথম সোপান হইল জীবনযাপনের আনন্দ। কৃচ্ছ্রসাধন পৈশাচিক। প্রার্থনা করা অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়া হাসা অনেক ভালো। গান কর। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর। দোহাই ঈশ্বরের, অপরের মধ্যে এই দুঃখের ভাব সংক্রামিত করিও না। কখনও ভাবিও না যে, ঈশ্বর একটু সুখ বা একটু দুঃখ লইয়া ব্যবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও সৌরভে পরিবেষ্টত হইয়া। থাকো। মুনিঋষিরা প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার জন্য পর্বতশিখরে যাইতেন।

দ্বিতীয় সোপান পবিত্রতা।

তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সদসৎ বিচার কর। অনুভব কর, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। যদি ক্ষণেকের জন্যও মনে কর, তুমি ঈশ্বর নও, তবে 'মহদ্ভয়ে' আক্রান্ত হইবে। যখনই চিন্তা করিবে 'সোঽহং' তখনই অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত কর। কেহ আমাদের অভিশাপ দিলেও তাহার মধ্যে আমার ঈশ্বরকেই দেখা উচিত। আমার দুর্বলতাবশতই তাহাকে আমি অভিশাপকারী মনে করি। যে দরিদ্র ব্যক্তির তুমি উপকার কর, সেও তোমাকে উপকার করার সুযোগ দিতেছে। ঈশ্বরই কৃপাবশতঃ তোমাকে ঐভাবে তাঁহার পূজা করিবার অধিকার দেন।

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করিতে পারো। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোচিত যত্নবান হও না বলিয়াই বিফল হও। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ।

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা অভদ্র গালাগালির দ্বারা দাবানো যায় না। যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই মুষ্টিমেয় 'গ্রীক' কথা বলে। ভুল-ত্রুটি কিছু না কিছু সর্বদাই থাকিবে, সেজন্য দুঃখ করিও না। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হও। মনে করিও না, 'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আহা! যদি আরও ভাল হইত!' মানুষের মধ্যে যদি দেবত্ব না থাকিত, তবে সব মানুষ এতদিনে প্রার্থনা এবং অনুশোচনা করিতে করিতে উন্মাদ হইয়া যাইত।

কেহই পড়িয়া থাকিবে না, কেহই বিনষ্ট হইবে না। সকলেই পরিণামে পূর্ণতা লাভ করিবে। দিনরাত বলো, 'ভ্রতৃগণ, ওঠ, এস। তোমরাই পবিত্রতার অনন্ত সাগর! দেবতা হইয়া যাও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও।'

সভ্যতা কাহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অনুভব করাই সভ্যতা। যখনই সময় পাইবে, তখনই এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কর। এরূপ করিলেই সব হইবে। যাহা কিছু ঈশ্বর নয়, তাহা অস্বীকার কর। যাহা কিছু ঈশ্বরভাবান্বিত, তাহা

দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কর। দিনরাত মনে মনে এ-কথা বলো। এভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞানের আবরণ পাতলা হইয়া যাইবে।

আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই; আমি স্ত্রী বা পুরুষ নই; আমার কোন সীমা নাই। আমি চিৎ-স্বরূপ-আমি সেই ব্রহ্ম। আমার ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আমার দুঃখ বা সুখ নাই। জন্ম বা মরণ আমার কখনও হয় নাই, কারণ আমি যে জ্ঞানস্বরূপ-আনন্দস্বরূপ। হে আমার আত্মা, আমি সেই, 'সোহহং' ।

নিজেকে দেহভাবশূন্য অনুভব কর। কোন কালে তোমার দেহ ছিল না। ইহা আগাগোড়া কুসংস্কার। দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, রোগপীড়িত-সকলের মধ্যে দিব্য চেতনা জাগাইয়া তোল।

বাহ্যতঃ প্রায় প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবীতে এই প্রকার ভাব-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। ছোট ছোট তরঙ্গ নানাদিকে উত্থিত হয়; কিন্তু একটি অন্যগুলি গ্রাস করে এবং সমাজকে প্লাবিত করে। যে ভাব-তরঙ্গের পিছনে সর্বাধিক চরিত্রবল আছে, তাহাই এইরূপ করিয়া থাকে।

কনফ্যুসিয়স, মুসা, পিথাগোরাস, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ,লুথার, ক্যালভিন, ও শিখগুরুগণ এবং থিওসফি, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্নিহিত ভাব-দেবত্ব প্রচার করা।

কখনও বলিও না, মানুষ দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্য যোগের মতোই। প্রেমই আদর্শ, প্রেম কোন বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা করে না। প্রেমই ঈশ্বর। সুতরাং এই ভক্তির পথেও আমরা আত্মা-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করি। 'সোহহম্'। নগর, দেশ, জীব, জগৎকে ভাল না বাসিলে কি ভাবে কাজ করা যায়?

বিচারের দ্বারা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করা যায়। নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরা সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করুক। এইভাবেই ঈশ্বর অনুভূত হন।

কিন্তু একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবেঃ কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। জানিও-ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই ধর্ম, অনুভূতিই ধর্ম। মানুষমাত্রেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। সর্বনিম্নস্তরের মানুষ পশু, উচ্চতম মানুষ সিদ্ধ বা পূর্ণ। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব্দ, বর্ণ, মতবাদ ও আচারঅনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই চিন্তা করিতে হয়।

পৌত্তলিকতা যে শেষ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষাঃ যখন বলো, 'আমি', তখন তোমার চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না? যদি শরীর-চিন্তা আসে, তবে তুমি এখনও পুতুলপূজক। ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়- ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। যদি ঈশ্বর-বিষয়ে 'চিন্তা' কর, তবে তুমি নিতান্তই মূর্খ। অজ্ঞ সাধক প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারা দার্শনিককেও অতিক্রম করিতে পারে। ঈশ্বরকে জানিবার জন্য কোন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। অপরের বিশ্বাস নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য নয়। ধর্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি সর্বতোভাবে আন্তরিক হও। কোন কিছুর সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিলেই আসক্তি ও কামনা উদ্ভূত হয়, তাহা হইতেই মানুষ দুঃখ পায়। এইরূপে দরিদ্র ব্যক্তি সোনা দেখিয়া সোনার আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে। সাক্ষিস্বরূপ হও। যাহাতে কখনও কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, এমন শিক্ষা লাভ কর।

৬. কর্মবিধান ও মুক্তি

মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রামের অর্থ কখনও ছিল না; কিন্তু আমাদের জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ সৃষ্টি করে।

বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভয় চলিয়া যাইবে। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বদ্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে থাকিয়া আমরা যে প্রকার মুক্তি অনুভব করি, উহা মুক্তির আভাস মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়।

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি-এ ধারণার সহিত আমি একমত নই। ইহার যে কি অর্থ, বুঝি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস অনুসারে জানা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে, উচ্চতর নিয়মের দ্বারা নিম্নতর নিয়ম জয় করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানেও জয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; এবং যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় করিতে চায়। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বৃক্ষ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই। ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না। তাই বলিয়া ইহারা মানুষের চেয়ে বড় নয়। এ জীবন মুক্তির এক প্রচন্ড ঘোষণা; এবং এই নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়বস্তু করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি-মাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয় জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে দেখিবে হিন্দুদের মতো আর কোন জাতির এত অধিক বিধি-নিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাতি-হিসাবে বিনাশ। কিন্তু হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব-তাঁহারা ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন মতবাদ বা গোঁড়ামির সৃষ্টি করেন নাই, তাই ধর্মের চরম উন্নতি হইয়াছে।

নিয়ম চিরন্তন হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ 'চিরন্তন বস্তু নিয়মের অন্তর্গত',-এ-কথা বলিলে চিরন্তনকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মানুষের সমান হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো তাহা দ্বারা বদ্ধ হইতেন। তবে তো ঈশ্বর ছাড়া কোন মহত্তর ভাব আছে বলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপঃ গালিচা-নির্মাতা একখন্ড গালিচা বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব তাহার বাহিরে ছিল (যাহা সে গালিচায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে)। যে-ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে মিলাইয়া চলিবেন, সেই ভাবটি কোথায়? ঠিক যেমন বড় বড় সম্রাটগণ কখন বা পুতুল লইয়া খেলা করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্রকৃতির সহিত খেলা করেন; এবং ইহাকেই আমরা বিধি বা নিয়ম বলি। আমরা ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ সেটুকু বেশ চলে। আমরা ঘটনার অংশটুকুই দেখিতে পাই; সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিবদ্ধ। এ-কথা বলা মূর্খতা যে, নিয়ম অনন্ত-প্রস্তরখন্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে। সকল যুক্তিই যদি অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরখন্ড পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? সুতরাং বিধি বা নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমরা আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি-মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়া যাই। ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে। এই নিয়মগুলি থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। বেদান্ত সর্বদা মুক্তির বাণীই ঘোষণা করে। বেদান্তবাদী নিয়মকে বড় ভয় পায়; চিরন্তন নিয়ম তাহার নিকট দারুণ ভীতির বস্তু। কারণ তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। চিরকাল যদি অনন্ত নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, তবে তৃণখন্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? আমরা বস্তুসম্পর্কশূন্য নিয়মে বিশ্বাস করি না।

আমরা বলি মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং ভগবানই সেই মুক্তি। অন্যান্য বস্তুতে যে আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ; কিন্তু সসীম বস্তুতে খুঁজিলে মানুষ সুখের কণামাত্র লাভ করে। সাধক ভগবানে যে-আনন্দ লাভ করে, চোর চুরি করিয়া সেই একই আনন্দ পায়; কিন্তু চোর দুঃখরাশির সহিত সুখের কণামাত্র পায়। ভগবানই প্রকৃত সুখ। প্রেমই ভগবান, মুক্তিই ভগবান। যাহা কিছু বন্ধন, তাহা ভগবান নয়।

মানুষের মধ্যে পূর্ব হইতেই মুক্তি আছে, কিন্তু উহা আবিষ্কার করিতে হইবে। মানুষ তো মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে সে এ-কথা ভুলিয়া যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করাই প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র জীবন। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞলোকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহা জ্ঞাতসারে আবিষ্কার করেন, আর অজ্ঞলোক আবিষ্কার করে অজ্ঞাতসারে। প্রত্যেকেই-অণু হইতে নক্ষত্র পর্যন্ত-মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে-ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অনুভব করেন, তাঁহাকে আরও দৃঢ়তর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি রেড ইন্ডিয়ানের স্বাধীন ভাবকে মোটেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন না।

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক ভাব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত ভাব, এবং মুক্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য। ইহার জন্যই মানুষ চেষ্টা করিতেছে। শুধু শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ বিজ্ঞানী কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি ঐ তরঙ্গাঘাত অসীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে পারে। তবে আমরা প্রকৃতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সম্মানিত করি না কেন? নিয়ম আমরা চাই না, আমরা চাই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য। আমরা বিধিবহির্ভূত হইতে চাই। নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইলে মৃৎপিন্ড হইয়া যাইবে। তুমি নিয়মের বাহিরে গিয়াছ কিনা-সেইটি প্রশ্ন নয়; কিন্তু আমরা নিয়মের ঊর্ধ্বে-এই চিন্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস রচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, একজন বনে বাস করে এবং কখনও কোন শিক্ষা-দীক্ষা পায় নাই। সে একটি পাথরের টুকরাকে নীচে পড়িতে দেখিল-এ তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা, সে কিন্তু ভাবে, ইহা মুক্তি; সে মনে

করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে; ইহার অন্তর্নিহিত ভাব মুক্তি। কিন্তু যখনই সে বুঝিতে পারে যে, পাথরের টুকরাটি অবশ্যই নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে স্বভাব বলে, অচেতন যন্ত্রবৎ কর্ম বলে। আমি এখন রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি। ইহাতেই মানুষ-হিসাবে আমার গৌরব। যদি আমি নিশ্চয় জানি যে, আমাকে এখন ওখানে যাইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া আমি যন্ত্রে পরিণত হই। অনন্ত শক্তি সত্ত্বেও প্রকৃতি একটি যন্ত্রমাত্র; মুক্তিই সচেতন জীবনের উপাদান।

বেদান্ত বলেন, বনের মানুষের ধারণাই ঠিক; তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল।

সে এই প্রকৃতিকে মুক্ত বলিয়া মনে করে, নিয়মের দ্বারা শাসিত মনে করে না। মানব-জীবনের এইসব অভিজ্ঞতার পরই আমরা এই প্রকার চিন্তা করিতে শিখিব, কিন্তু আরও দার্শনিক অর্থে। উদাহরণস্বরূপঃ আমি রাস্তায় বাহির হইতে চাই। ইচ্ছার প্রেরণা পাইলাম, তারপর থামিয়া গেলাম; ইচ্ছা হওয়া ও রাস্তায় বাহির হওয়ার মধ্যে যে-সময়টুকুর ব্যবধান, সেই সময়ে আমি সমভাবে কাজ করিতে থাকি। কর্মের সঙ্গতিকেই আমরা নিয়ম বা বিধি বলি। আমার কর্মের এই সঙ্গতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেজন্যই আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মাধীন বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। পাঁচ মিনিট ভ্রমণ করি; কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিট সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। এই ইচ্ছাই ভ্রমণের আবেগ দিয়াছিল। সুতরাং মানুষ বলে যে সে স্বাধীন, কারণ তাহার সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়; এবং যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সে-সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির অনুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা স্বাধীনতা ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খন্ডগুলি দেখিতে পাই; কিন্তু আদি ও অন্ত অবশ্যই স্বাধীন আবেগ। প্রথমেই মুক্তির প্রেরণা প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাই বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু আমাদের কার্যকালের তুলনায় প্রকৃতির কার্যকাল দীর্ঘতর। দার্শনিক যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, আমরা স্বাধীন বা মুক্ত নই। তথাপি এই চেতনা থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত। এই চেতনা কিভাবে আসে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের মধ্যে এই দুইটি প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি

বলে, সব কার্যেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রেরণাদ্বারা আমরা আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই-মুক্তি বা স্বাধীনতা ভিতরেই আছে, আত্মা যথার্থই মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মার কর্ম শরীর-মনের ভিতর দিয়া পরিস্রুত হইয়া আসিতেছে; এই শরীর ও মন স্বাধীন বা মুক্ত নয়।

যখনই আমরা কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা উহার দাস হইয়া পড়ি। কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম। ঐ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম। অতএব আমাদের মুক্ত-স্বভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্তু বা অতি দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা মুনি জন্তু বা মানুষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহজীবনেই তাঁহারা আপেক্ষিক নানা-দর্শন জয় করিয়া এই একত্ব বা সমদর্শনের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা চলিয়াছি, প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতি, মানবজাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবারই প্রচেষ্টা। যে অর্থ চায়, সে মুক্তির জন্যই চেষ্টা করিতেছে-দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ মুক্তিলাভ করাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব কর্মই সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। যে-সকল কর্ম সেই উদ্দেশ্যের পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্বই উপাসনা করিতেছে; মানুষ শুধু জানে না যে, যখন সে কাহাকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও সে আর একভাবে সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহারা অভিশাপ দিতেছে, তাহারাও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কখনও ভাবে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করা কঠিন।

আমরা সীমাবদ্ধ-এই বিশ্বাস বর্জন করিতে পারিলে এখনই আমাদের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হইত। ইহা শুধু সময়-সাপেক্ষ। যদি তাই হয়. তবে শক্তি বর্ধিত কর, এইভাবে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্য অবগত হইয়া মাত্র বারো বৎসরে উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত বৎসর।